দোল উৎসব

মাসুম আওয়াল

বারো মাসে তের পার্বণ শব্দটির সঙ্গে আমরা কম বেশি সবাই পরিচিত। সনাতন হিন্দুদের যতগুলো পার্বণ আছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পার্বণ হচ্ছে দোল পূর্ণিমা বা দোল উৎসব। দোলকে রঙের উৎসবও বলা হয়। দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দোলযাত্রা হয় ও দেশের বিভিন্ন স্থানে দোল উৎসব পালিত হয়। তবে, এই উৎসব মূলত বাঙালিরাই পালন করে থাকেন। দোল উদ্‌যাপনের দিনে রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠে চারপাশ।

দোল উৎসবের দিন-ক্ষণ

প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উদ্‌যাপিত হয় দোল পূর্ণিমা বা দোল উৎসব। কোথাও এই দোল পূর্ণিমাকে দোলযাত্রা বলে। গৌড়বঙ্গে বা বাংলায় দোল উৎসবের সূচনা করেছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দোল পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল এই পূর্ণিমার তিথিতে, তাই দোল পূর্ণিমাকে গৌরী পূর্ণিমা বলা হয়। দোল পূর্ণিমা পৌরাণিক ঘটনা। এই তিথিতে বৃন্দাবনে আবির ও গুলাল নিয়ে শ্রী কৃষ্ণ, রাধা এবং তার গোপীগণের সঙ্গে হোলি খেলেছিলেন আর সেই ঘটনা থেকে উৎপত্তি হয় দোল খেলা। রঙের উৎসবে কম বেশি সামিল হোন সকলেই। এই বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় পূজা হয়। দোল পূর্ণিমা হিন্দু ধর্মের জন্যে খুব শুভ বলে মনে করা হয়। এই বছর দোলযাত্রা পড়েছে ৭ মার্চ (বাংলায় ২২ ফাল্গুন)। এই দিনটিকে বসন্ত উৎসবও বলা হয়। হোলি সাধারণত দোলের পরের দিন পালিত হয়। এবছর হোলি পড়েছে ৮ মার্চ।

দোল উৎসবের আরও ইতিহাস

দ্বাপর যুগের কথা। সেই সময় দুই দৈত্যের অত্যাচারে মথুরাবাসী অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ছিলেন। সব সময় তারা ভয়ে-আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন। সে সময়ে সকল মথুরাবাসী এক হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাদের এই অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেন এবং অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে অনুরোধ করেন। ঠিক ফাল্গুনী পূর্ণিমার আগের দিন শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মিলে ওই দুই দৈত্যকে হত্যা করেন। এর পর সন্ধ্যার সময় শুকনো কাঠ, খড়কুটো দিয়ে তাদের আগুনে পুড়িয়ে দেন। সেই দিন থেকে ন্যাড়া পোড়া প্রচলিত হয়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ দুই দৈত্যের অত্যাচার থেকে মথুরাসাবীকে মুক্তি দিলেন। মথুরাবাসী তাদের এই মুক্তির দিনটি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে রঙে রঙে উদ্‌যাপন করেন। সে দিন থেকেই শুরু হয় এই দোল উৎসব।

আধুনিক বাংলায় ‘দোল’

আধুনিক বাংলায় দোলযাত্রার সূচনা করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২০ সালে শান্তিনিকেতনে তিনি দোলযাত্রা উৎসবের সূচনা করেন। তবে, সেটা দোল উৎসব হিসেবে নয়। বসন্ত উৎসব হিসেবেই শান্তিনিকেতনে দোল পূর্ণিমার দিন পালিত হয়। এর আগে ১৯০৭ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুরু করেছিলেন ঋতুরঙ্গ উৎসব। সেদিন শান্তিনিকেতনের প্রাণ কুঠিরের সামনে শুরু হয় এ উৎসব। এখন অবশ্য সেদিনের প্রাণ কুঠির শমীন্দ্র পাঠাগার হিসেবে পরিচিত। সেই ঋতুরঙ্গ উৎসবই আজকের বসন্ত উৎসব। আগে বসন্তের যেকোনো দিন অনুষ্ঠিত হতো এ উৎসব। পরবর্তীকালে অবশ্য বসন্ত পূর্ণিমার দিনই অনুষ্ঠিত হয় এ উৎসব। এ উৎসব অবশ্য ঋতুরাজ বসন্তে স্বাগত জানানোর উৎসব। বাঙালির কাছে এই দোল উৎসবের এক বিশেষ আবেগ রয়েছে। বছরের এই একটা দিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন মানুষ। মথুরাবাসীর মতো এই বিশেষ দিনে দেশবাসী

রঙের খেলায় মেতে ওঠেন। শহরের মানুষের সঙ্গে গ্রামবাংলার মানুষ যেন মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এই উৎসব ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য। এই উৎসবে গা ভাসিয়ে দেন সকলে।

বিভিন্ন আখ্যান ও সাহিত্যে দোল

হিন্দু পুরাণে প্রায় দুই হাজার বছর আগে গোকুলে এই উৎসবের প্রচলন ছিল বলে জানা গিয়েছে। বেদ, ভবিষ্য পুরাণ ও নারদ পুরাণে এই উৎসবের বর্ণনা রয়েছে। আবার জৈমিনির 'পূর্ব মীমাংসা সূত্র'-য় দোলযাত্রার কথা উল্লেখ আছে। সংস্কৃত সাহিত্য 'মালতি মাধব'-এ রয়েছে এই উৎসবের কথা। বিন্ধ্য পার্বত্য অঞ্চলে প্রাপ্ত লিপি থেকেও অনুমান করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে এই উৎসবের প্রচলন ছিল। মহাকবি কালীদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যের বসন্ত বর্ণনায় দেখা গিয়েছে, যুবতী ও নারীরা কৃষ্ণ চন্দন, কুসুম রঙ ও কুমকুম মিশ্রিত রঙে নিজেদের রাঙিয়ে তুলছেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট হর্ষবর্ধনের লেখা 'রত্নাবলী' নাটকেও এই উৎসবের উল্লেখ রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরের হাম্পিতে এক মন্দিরের দেওয়ালে এক রাজকুমার ও রাজকুমারীর রঙের উৎসবে মেতে ওঠার দৃশ্য খোদাই করা আছে। তবে, এই যে এত রঙের উৎসবের কথা রয়েছে– কোনওটাই দোল নামে নয়। সবটাই আছে 'হোলি' নামে।

দোল উৎসব মূলত হিন্দু বৈষ্ণবদের উৎসব। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী, এ দিন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধিকা এবং তার সখীদের সঙ্গে আবির খেলেছিলেন। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের রচনায় দোলের নানা উল্লেখ মেলে। যেমন তিনি লিখেছেন 'খেলত ফাগু বৃন্দাবন-চান্দ। ঋতুপতি মন মথ মন মথ ছান্দ। সুন্দরীগণ করমণ্ডলী মাঝ। রঙ্গিনি প্রেম তরঙ্গিনী সাজ।। আগু ফাগু দেই নাগরি-নয়নে। অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়নে।'

হোলি ও দোলযাত্রা কী এক?

দোল ও হোলি একই অর্থে ব্যবহার হলেও এই দুটি বিষয় কিন্তু আসলে এক নয়। এই দুটি আলাদা। ভিন্ন তাৎপর্যও রয়েছে। বাংলায় দোলযাত্রা, দোল পূর্ণিমা বা দোল উৎসব নামে পরিচিত হলেও ভারতের অন্যত্র বেশিরভাগ জায়গাতেই রঙের উৎসবকে হোলি বলা হয়। ক্যালেন্ডারে বছরের দুটি দিন চিহ্নিত করা থাকে। একদিন দোল ও তার পরের দিন হোলি। এই দু'দিনই 'হ্যাপি হোলি' বলে শুভেচ্ছা আদান প্রদান করেন অনেকে। কেউ শুধরে দিয়ে বলেন 'আজ দোল, কাল হোলি'। প্রত্যুত্তরে অনেকে বলেন 'দোল ও হোলি একই ব্যাপার'। ব্যবহারিক প্রয়োগ, অর্থাৎ উৎসব আয়োজন ও পালনের আঙ্গিক এক তবে এই দুটির আলাদা এবং ভিন্ন তাৎপর্য আছে। ভগবান বিষ্ণুর দুটি অবতার এর সঙ্গে যুক্ত। তবে পার্থক্য এই যে একটি শ্রীকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে যুক্ত, অপরটি নৃসিংহ দেবের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বের বৃহত্তম রঙের উৎসব দোল বা হোলি। বাংলায় এটি দোলযাত্রা, দোল পূর্ণিমা বা দোল উৎসব নামে পরিচিত। তবে ভারতের অন্যত্র বেশিরভাগ জায়গাতেই রঙের উৎসবকে হোলি বলা হয়। দোলযাত্রা বা দোল পূর্ণিমা পালিত হয় রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনির ওপর ভিত্তি করে। আর হোলি পালন করা হয় নৃসিংহ অবতারের হাতে হিরণ্যকশিপু বধ হওয়ার যে পৌরাণিক কাহিনি, তার ওপর ভিত্তি করে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা রাতের পরের দিন দোল উৎসব পালন করা হয়। সেদিনই কৃষ্ণ রাধার প্রতি তার প্রেম নিবেদন করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

অন্যদিকে রাক্ষস রাজা হিরণ্যকশিপুর পুত্র ছিলেন প্রহ্লাদ। দৈত্যকুলের মধ্যে প্রহ্লাদ একাই ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। ছেলের এই বিষ্ণু ভক্তি দেখে পিতা হিরণ্যকশিপু ছেলেকে বধ করার চেষ্টা করেন। এই কাজে হিরণ্যকশিপুকে সাহায্য করেছিলেন তার বোন হোলিকা। প্রহ্লাদকে হত্যা করার জন্য হিরণ্যকশিপুর বোন হোলিকা প্রহ্লাদকে আগুনে নিক্ষেপ করার পরিকল্পনা করেন। বিষ্ণুর কৃপায় আগুন প্রহ্লাদকে স্পর্শ করতে না পারলেও সেই আগুনে পুড়ে মারা যান হোলিকা। তার হোলি হলো অশুভ শক্তির পরাজয় ও শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক। তাই হোলির আগের দিন হোলিকা দহন পালন করা হয়।

শেষ কথা

লক্ষ্মণ ভাণ্ডারীর লেখা একটা কবিতার পড়তে পড়তে শেষ করা যেতে পারে এই গদ্যটি। পূর্ণিমায় দোলযাত্রা, রঙের বাহার/হৃদয়ে পুলক জাগে, খুশিতে সবার।/ফুটেছে পলাশ ফুল, লোহিত বরণ/ প্রকৃতির শোভা হেরি, হরষিত মন।/ ব্রজধামে হোলি খেলে, ব্রজের নন্দন/রাই কানু এক সাথে, সঙ্গে গোপীগণ।/ রঙে রঙে ব্রজপুরে, ছেয়েছে আকাশ/ আবীর রাঙানো রবি, হাসিছে বাতাস।/ কচিকাঁচা, ছেলে বুড়ো, কিশোর কিশোরী/ সবে মিলে হোলি খেলে, মারে পিচকারী।/হাতে রং, মুখে রং, রং লাগে গায়ে/ছোটরা আবীর দেয়, বড়োদের পায়ে/ধন্য পূণ্য দোল যাত্রা, মহা ধূম ধাম/বর্ষে বর্ষে দোল আসে, নাহিক বিরাম।